‘এ লং ওয়ে ফ্রম মাই হোম’

স্কুলের ম্যাগাজিনে নিজের নামটি ছাপার অক্ষরে দেখি ১৯৯৭ সালে। ক্লাস নাইনে পড়ি তখন। শিরোনাম ‘বর্তমান ভারতীয় সভ্যতা’। কবিতা নয়, গল্প নয়, ভ্রমণ কাহিনীও নয়। রীতিমত দেশের তদানীন্তন পরিস্থিতির তীব্র সমালোচনা করে যে লেখা লিখেছিলাম তাতে হতাশাই ছিল বেশী। সেইসময় দাদা কলেজে পড়ত। বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিল একটি ক্যাসেট, ‘এদেশ তোমার এদেশ আমার’–স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইনডিয়া থেকে প্রকাশিত সেই ক্যাসেটটির একটা গান এখনও মনে পড়ে ‘মাউন্ত ব্যাতেন সাহেবও, তোমার সাধের ব্যাতন কাহার হাতে থুইয়া গেলে হায়’.....বার বার শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল দেশ ভালো নেই, আমরা ভালো নেই। ব্যাস, নিজের কিছু কথা আর ক্যাসেটের সারাংশ মিলিয়ে তৈরি হল লেখা। ওমা সেই লেখা ছাপাও হল! নিজের লেখা দুই পাতা জুড়ে ছাপা হয়েছে এই গর্ববোধে রীতিমত একটা উপন্যাস লিখতে শুরু

করে দিই। আমার বাল্য প্রেমিকা জানত এমন মহান কিছু একটা লেখা হচ্ছে যে যেটা লেখা হয়ে গেলে নাকি লেখকের নাম ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বজুড়ে, আর সে হয়ে যাবে পর। তার নামটি পালটে, আমাদের গ্রামের নাম, মা বাবার নাম বদলে যে উপন্যাসটি ফেঁদে বসেছিলাম সেটি 'ছোটদের পথের পাঁচালী'র হুবহু নকল ছিল। ছয়টি পরিচ্ছেদ লেখার পর সেই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। তবু লেখার চেষ্টা থামল না, একাদশ শ্রেণীতে মাথায় ঢুকল কবিতা। সুকান্ত-জীবনানন্দ থেকে শক্তি-জয়, র‍্যাবো-মলিয়ের থেকে বোদলেয়ার-গিন্সবার্গ সবার বই (অনুবাদ) কিনে কিনে পড়ে পড়ে বুঝতে পারি আমি আর যাই হই কবি নই, হতেও পারব না। ছোটগল্প লেখার ভূত মাথায় চাপল ফার্স্ত ইয়ারে। চেখভ-মোপাসা, লাতিন আমেরিকা-তৃতীয় বিশ্ব, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র মানিক-বিভূতি-তারাশঙ্কর সুবোধ-প্রেমেন্দ্র সব পড়ে গোটা চারেক গল্প লিখে সেকেন্ড ইয়ারেই পরিত্যক্ত হল লেখক হওয়ার পরিকল্পনা। কত গল্প উপন্যাসের পরিকল্পনা কত কবিতা লিখতে বসে লেখার মাঝপথে ছেড়ে দিতে হয়েছে কিচ্ছু হচ্ছে না বলে। এমনকি দেখছিলাম সমসাময়িক হতেও পারছিনা। যা করছি সেটা না করলেও চলে। এক এক সময় না লেখা বিষয়গুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই, ভাগ্যিস লিখিনি সেসব। 'এক পৃথিবী লিখব বলে একটা খাতাও শেষ করিনি' একটাই কারণে, বুঝে ফেলেছিলাম বাজে লেখা পড়িয়ে অন্যের সময় নষ্ট করার অধিকার আমার নেই। এখন তাই মাথায় ঢুকল নাটক। দেখলাম নাটক পরিচালনা ব্যাপারটা মোটামুটি সহজ। অন্যের লেখা একটা ভালো নাটক অন্য মানুষদের দিয়ে নিজের মনের মত করে বলানো ও চলাফেরা করানো; বকাঝকাও করা যায় আবার তাতে সম্মানও জোটে। মুশকিল হল ইউনিভার্সিটি গিয়ে। ঢুকল সিনেমার পোকা। ব্যাস সেও খেয়ে নিল জীবনের দশটা বছর। আপাতত নাটক-সিনেমার পরিণতিও হয়েছে ছেলেবেলার উপন্যাস লেখার পরিকল্পনার মত। অতএব বাকি ছিল সম্পাদক হওয়া। কলম থামলে সব বাঙালীর যা পরিণতি হয় সেটাও হয়ে গেলাম। লোককে লেখা চেয়ে তাগাদা দাও, অন্যের লেখা বাতিল কর, কিচ্ছু

হয়নি বলে আবার লেখাও। লেখা সাজাও, প্রুফ দেখ, প্রেসে যাতায়াত করে সময় কাটাও। আর অন্যের পত্রিকার নিন্দে কর।

গত বছর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উত্তমবাবু ডেকে বললেন, পত্রিকা বের করতে হবে। স্কুল ম্যাগাজিনের সম্পাদক হওয়ার অভিজ্ঞতা ছিলনা যে তা নয়। ২০১০এ শেষ মুহূর্তে সেবার প্রধান শিক্ষকের পরামর্শে অন্য স্যারের নাম দিতে হয় তাঁরা আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন বলে। এবার তাই প্রথমেই বলে দিই, কারো নাম ঠিক করা থাকলে আমি নেই। ☺ না, গত তিনমাস আগাগোড়া নিজের দায়িত্বে কাজ করে আজ স্কুলের পত্রিকা 'উদ্বোধন' হাতে পেলাম ও ছাপার অক্ষরে 'সম্পাদক- সুব্রত ঘোষ' দেখে অদ্ভুত এক আনন্দ হল। যেন সেই ক্লাস নাইনের আমি। ছাপার অক্ষরে নিজের নামকে দেখার লোভ আমার এখনও কমেনি। লেখক থেকে সম্পাদক হওয়ার দীর্ঘ পথের শেষে যেন একটা বৃত্ত পূর্ণ হল আজ এই বৃষ্টি ভেজা বিকেলে। এই বোলপুর স্কুল বাগানের মীরা অফসেটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে।